ফিরে দেখা ১/১১

আশীর্বাদ না অভিশাপ?

মাসুদা ভাট্টি

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। লন্ডনে বসবাস করেন এক বাঙালী একটি ভিসিডি দিয়েছেন, সেটি দেখে ট্রান্সক্রিপশন করে দিতে হবে। আমি ভেবেছি, সরকারী কোন প্রচারণা হবে। কিন্তু যখনই ভিসিডিটি ল্যাপটপে দেখতে শুরু করি তখন বিস্ময়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা। সিলেটের একটি হোটেল, যার মালিক প্রবাসী। বাংলাদেশ থেকে ফোন করে লন্ডনে সেই প্রবাসী হোটেল মালিককে হুমকি দেয়া হচ্ছে এই বলে যে, যে জমির ওপর হোটেলটি নির্মাণ করা হয়েছে তা অবৈধ সম্পত্তি, অতএব এই হোটেলটির মালিককে হুমকি প্রদানকারীকে দুই কোটি টাকা দিতে হবে। নইলে হোটেলসহ সিলেট শহরের অভিজাত এলাকার সেই জমি নিয়ে নেয়া হবে। যিনি ফোন করছেন তিনি তার নাম ধাম কোন কিছুই গোপন করেননি। তিনি সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা। এই কর্মকর্তা একজন প্রতিনিধিকে লন্ডনে পাঠিয়েছেন এবং তিনি এসে হোটেল মালিককে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, দুই কোটি টাকা না দিলে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে এবং সেই একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে ফোন করে সেই সেনা কর্মকর্তাও বারবার টাকা দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। হোটেল মালিক ভদ্রলোক কৌশলে উপস্থিত ব্যক্তি ও টেলিফোনে কথোপকথনের ভিডিওচিত্র তুলেছেন এবং বিষয়টি বর্তমানে আদালত পর্যন্ত গড়াচ্ছে বলে শুনেছি। এবং সে কারণেই ভিসিডিটির ট্রান্সক্রিপশন করার প্রয়োজন পড়েছে। হোটেল মালিক ভদ্রলোক জানালেন যে, তিনি একা নন, এ রকম বহু প্রবাসী বাঙালী যাদের সিলেটে সম্পত্তি রয়েছে তাদের অনেকেই এ রকম ব্লাকমেলিংয়ের শিকার হয়েছেন এবং অনেকেই অর্থ দিয়ে মুক্ত হয়েছেন।

আমি সরকারী ও রাষ্ট্রের বড় কোন লেনদেনের কথা তুলতে চাই না। শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যে সব দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে তা জোট সরকারের দুর্নীতির তুলনায় কোন অংশে কম নয়। এখন তো সরকারের বড় লেনদেনের অনেক গোপন তথ্যও বেরিয়ে পড়ছে থলে থেকে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সাবেক সেনা কর্মকর্তা মতিন সম্পর্কে যে সব অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা কি গা শিউরে ওঠার মতো নয়? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে টেলিভিশন অন করলেই কয়েক জন উপদেষ্টাকে দেখা যেত সেজেগুজে সাংবাদিকদের মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে জাতিকে ছবক দিতেন। সবচেয়ে মজা লাগত ডিআইজি প্রিজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর শামসুল হায়দার সিদ্দিকীকে দেখে। তিনি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একদম নতুন জামাইয়ের বেশে প্রতিদিন টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের খবরাখবর দিতেন। ওপরে তার হাসিমুখ আর ভেতরে ভেতরে তিনি কী সব কুকর্ম করেছেন তার খবর এখন জানা যাচ্ছে। জেলহত্যা দিবসে তিনি এক সন্ত্রাসী আসামিকে পাশে বসিয়ে নৃত্য উপভোগ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত কারা প্রকোষ্ঠকে ভেঙ্গে ফেলেছেন এবং একই সময়ে রাজশাহীতে জেলের ভেতর পুরনো শিবমন্দিরের চিহ্নও রাখা হয়নি। এখন তো এ কথাও জানা যাচ্ছে যে, সেই সময় কারাগার ছিল অসম্ভব সম্ভাবনাময় এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এ সময় এখানে হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে এবং সবই হয়েছে কারারক্ষী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের হাত দিয়ে। আমরা দেখেছি, আদালতে বিচারকের পাশেই একজন মেজর বসে আছেন, তার সেখানে কী কাজ তখন কেউ প্রশ্ন করারও সুযোগ পায়নি। সেই সময় গাজীপুরের কোন একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, তার কাছে একজন সেনা কর্মকর্তা বিরাট অঙ্কের অর্থ দাবি করেছেন। তিনি সেই অর্থ দিতে না পেরে দীর্ঘদিন পালিয়ে ছিলেন। দেশব্যাপী এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে যা জোট সরকারের আমলের আতঙ্ককে মানুষের সামনে নিয়ে এসেছিল। যে কারণে মাত্র কয়েক মাসের মাথায় জনগণের মাঝে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রক্ষক থেকে ভক্ষকে রূপান্তরিত হয়। ১/১১-কে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের এর আগে-পিছে অনেক ঘটনা ও দিক নিয়ে ভাবতে হবে। বিশেষ করে একে ঘিরে কয়েকটি পক্ষের নানা কর্মকাণ্ড আমাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবে। তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমদের নেতৃত্বে যে শক্তিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একটি শক্তিশালী কাঠামো দিয়েছিল তাতে জামাকাপড় হিসেবে কাজ করেছিল একটি সিভিল-বাহিনী। ড. ফখরুদ্দীন এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেটা আমি মনে করি না। তিনি ছিলেন এই বাহিনীর লোকদেখানো মুখপাত্র মাত্র। বেগম জিয়া তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবর্নর বানিয়েছিলেন। আবার তাঁকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা হলো। শোনা যায়, প্রথমে ড. ইউনুসকে এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি রাজি হননি এবং তিনিই নাকি ড. ফখরুদ্দীনের নাম প্রস্তাব করেন। মজার ব্যাপার হলো, সেনাবাহিনীর কোন সদস্য কিন্তু ফখরুদ্দীনের কাছে যাননি, গিয়েছিলেন সুশীল সমাজের তিনজন প্রতিনিধি। প্রশ্ন হলো, সেদিন কার নির্দেশে বা কার পরিকল্পনায় এসব কর্মকাণ্ড ঘটেছিল? বাংলাদেশ একটি ছোট রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রের মাথা-মুণ্ড-ধড় সবই বলতে গেলে ঢাকাকেন্দ্রিক। ক্ষুদ্র অথচ অসম্ভব শক্তিধর একটি বলয় এই রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার পর থেকেই বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পরিচালনা করে আসছে। প্রথমে এরা সেনাবাহিনী ও শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করলেও এখন তারা নিজেরাই এতটা শক্তি অর্জন করেছেন যে, ১/১১-র মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের কিং-মেকার হিসেবে এরা এদের দক্ষতা ও ক্ষমতার চাক্ষুষ পরিচয় আমাদেরকে দেখিয়েছেন। ১/১১-র পর পরই সেনাবাহিনী ও তথাকথিত এই সুশীল সমাজ মিলে একটা মৌরসিপাট্টা শাসনব্যবস্থা প্রচলন করেন। স্বভাবতই চিহ্নিত রাজনীতিবিদরা তখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকেও এই অক্ষশক্তির আস্থাভাজন হিসেবে দেখতে পাই আমরা। কেউ প্রাণের ভয়ে, কেউ জেল-জুলুমের ভয়ে, আবার কেউ বা নিজ দলের নেতাকে সরিয়ে নিজে সর্বোচ্চ নেতা হবার লোভে এবং কাউকে পূর্বকৃত দুর্নীতির খাতা দেখিয়ে চাপ প্রয়োগ করে প্রচলিত রাজনৈতিক শক্তির বিপক্ষে একটি “লাটাই-সুতো” লাগানো রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালু করার চেষ্টা হয় তখন। রাজনীতিকে যদি একটি ঘুড়ি হিসেবে কল্পনা করি তাহলে সেনা-সুশীল অক্ষশক্তিটির হাতে ছিল তার লাটাই ও সুতো। আর এই অক্ষশক্তির সুতোটি কার হাতে ছিল, সে কোটি কোটি টাকা মূল্যের প্রশ্ন। সে কথায় পরে আসছি।

আজকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলসহ সরকারী ও বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন নেতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তাদের ওপর নেমে আসা জেল-জুলুমের জন্য শুধু সেনাবাহিনীকে দায়ী করছেন। আমার মনে হয়, এতে বাংলাদেশের ভাগ্য-দোষকে খুব সরলীকরণ করা হবে। কারণ, একটি সুনির্দিষ্ট বাহিনীর পক্ষে কোন দেশের সর্বময় ক্ষমতা রাতারাতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তারা হয়ত কেন্দ্রে থাকে, কিন্তু তাদের চারপাশে যারা থাকে তাদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করেন তারা কিন্তু কম দোষী নয়। আমরা আজ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীর আর কোন খোঁজ-খবর রাখি না, টিভিতে কিংবা সংবাদপত্রে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। অথচ তিনি এতদিন এতটাই সরব ছিলেন যে, মাঝে মধ্যে তাঁকে বেদনাদায়কভাবে বিরক্তিকর মনে হতো। তিনি দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন, কিন্তু কখনই জনগণের কাছে আসতে

পারেননি। যদি পারতেন তাহলে বুঝতেন যে, জনগণের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া যায় না। জনগণ গরু নয় যে, তার ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে হালচাষ করানো সম্ভব হবে। কিছু সময়ের জন্য সেটা সম্ভবপর হলেও একজন জনগণ ঠিকই তার ঘাড় থেকে জোয়াল ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো আক্রমণ করতে সক্ষম। এটা খুব সত্যি যে, ১/১১-র আসল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ঘাড়ে একটি সাজানো ও পাতানো শক্তিকে শাসনকর্তা সাজিয়ে জোয়াল হিসেবে তুলে দেয়া। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাংলাদেশের জনগণের ওপর এ রকম ক্ষমতার জোয়াল তুলে দেয়া খুব সোজা, কারণ এখানে জনগণ রাজনৈতিকভাবে অসচেতন, অর্থ ও অস্ত্রের ভয়ে ভীত এবং অভাবের কারণে খুব সহজেই ক্ষমতার কাছে বিক্রি হওয়ার মতো। এ দিক দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের খুব একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

তবে একটি জায়গায় পাকিস্তানী জনগণের সঙ্গে বাঙালীর পার্থক্য রয়েছে আর সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশে একটি মোটামুটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যেটা পাকিস্তানে নেই। বাংলাদেশে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি মূলত আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভোগে বলে তাদের ওপর ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ চলে যায় বিভিন্ন শক্তি-বলয়ের হাতে। হয়ত বাংলাদেশের বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি বলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এখনও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসেনি। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে দু'একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকলেও তারা যে মূল ক্ষমতাধর নন তার প্রমাণ দেয়ার জন্য এই ছোট্ট নিবন্ধ যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে কোন স্বতন্ত্র লেখায় আলোচনা করা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষাবঞ্চিত যে বিশাল শ্রেণী, তারা শুধু কায়িক পরিশ্রম করে দেশটিকে টিকিয়ে রেখেছে। যেহেতু পঁচাত্তরের পরে একমাত্র গত নির্বাচন ছাড়া কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু হয়নি সেহেতু তারা কোনভাবেই রাষ্ট্র ক্ষমতার হাত বদলের ভাগিদার নন। রেডিও বা টিভিতে ভাষণ শুনে তারা জানতে পারে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতার হাতবদল ঘটেছে। অপরদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাতে তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে বেছে নিতে না পারে সে জন্য জাল ভোটার তালিকা বানিয়ে তাদেরকেও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারিত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে এই শ্রেণীর ভেতরে টাকা ছড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে আরেকটি বিশেষ শ্রেণী, যারা সংখ্যায় কম হলেও অর্থ বলে (অর্থ থাকলেই অস্ত্রবলও জোটে) রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে যায়। মোটকথা গোটা সমাজব্যবস্থাকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে "ডিভাইড এ্যান্ড রুল"-এর প্রকৃত চেহারাটি বাংলাদেশে সর্বত্র দৃশ্যমান। এমতাবস্থায় যখন ইয়াজউদ্দিন সাহেবের পাগলামিতে (এখন তো তার স্ত্রী তাকে পাগল বলে গণমধ্যমকে জানিয়েছেন। যখন নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটছে তখন জনগণের দাবির কথা বলেই কিন্তু সেনাবাহিনী রাষ্ট্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু এ কথা আমরা কোনবারই প্রমাণ করার সুযোগ পাইনি যে, জনগণ আসলেই সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় দেখতে চায় কি না। জিয়াউর রহমান কিংবা এরশাদ এবং হালে মইন উ আহমেদ– সকলেই এই জনগণের দাবি(?) মেনেই রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়েছেন (মইন উ আহমেদ পুরোপুরি নন) কিন্তু এই উদ্ভট দাবি জনগণ শুধু সেনাবাহিনীর কানে কানেই করে, এর সরব প্রকাশ আমরা কোনদিনই শুনিনি। দুঃখজনকভাবে সেনাবাহিনী সম্পর্কে কথা বলতে গেলেই পাকিস্তানের উদাহরণ চলে আসে। পাকিস্তানেও এই জনগণের দাবির দোহাই দিয়ে বারবার নির্বাচিত সরকারকে সেনাবাহিনী উৎখাত করে।

তবে আগেই বলেছি যে, ১/১১-সহ সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রতিটি হস্তক্ষেপে জনগণের ভেতর থেকে একটি অংশ সব সময়ই সেনাবাহিনীকে সঙ্গ দেয়। এতে বিচারপতি থেকে শুরু করে সরকারী কর্মকতা, সম্পাদক, আইনজীবী এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী তো অবশ্যই। ১/১১-র সেনা সমর্থিত সরকার অবশ্য একটি ভুল করেছিল যে, তারা ব্যবসায়ী শ্রেণীটিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। মনে করেছিল যে, সুশীল সমাজ ও বিদেশী সমর্থন হলেই বুঝি তাদের চলবে। যে কারণে ব্যবসায়ীদেরকে জেলে ঢুকিয়ে তাদের হাত থেকে ব্যবসাটাকে সেনাবাহিনী দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত ঘটনা ঘটে। সীমাহীন লুটপাটের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির আগেই বারোটা বাজিয়েই গিয়েছিল জোট সরকার। আর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে নতুন করে লুটপাট শুরু করায় অর্থনীতির কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকা হয়। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি, আজ এ কথা কেউ বলে না যে, চালের দাম তখন কেন এত বেড়েছিল আর এখন কেন এত কম?

যা হোক, কথা দিয়েছিলাম এই পর্বে ১/১১ বিষয়ক কড়চা শেষ করব। এই সময়টি সম্পর্কে কথা বলতে হলে বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের কয়েকজনের কথা না বলা হলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার সাংবাদিক বন্ধুরা বিদেশী রাষ্ট্রদূত বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইইউ-র রাষ্ট্রদূতদের সামনে পেলেই মাইক্রোফোনটি বাড়িয়ে দেন, আর তত্ত্বাবধায়ক আমলে এর সবচেয়ে বেশি প্র্যাকটিস হয়েছে। তারাও যে যার অবস্থান থেকে বচন শুনিয়েছেন আমাদের। মোট কথা ১/১১ সরকারের তিনটি প্রধান পক্ষের মধ্যে সেনাবাহিনী, সুশীল সমাজ আর এই বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ অন্যতম। এর বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা নানাভাবে আক্রান্ত, ভীত, লোভগ্রস্ত এবং ভাগ্যোন্নয়নের নেশায় বুঁদ। আমার মাঝে মধ্যে খুব আশ্চর্য লাগে যে, সেনাবাহিনী কেন ১/১১-র পরে বিএনপির সঙ্গে আগের মতো ঘনিষ্ঠতা রাখেনি। এর মূল কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন যে, তারেক জিয়ার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন এবং নিজেকে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াটা এবং এ কারণে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পর্যন্ত হেনস্থা করাটা অনেক সেনা কর্মকর্তাই সঠিকভাবে গ্রহণ করেননি। অপরদিকে খালেদা জিয়ার ভাই মেজর সাঈদ ইস্কান্দর গোটা সেনাবাহিনীকেই বিএনপির চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার করায় সেনাবাহিনী আসলে বিএনপির কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়। এর সত্য-মিথ্যে কিছুই জানি না, এসব সবই অনুমান মাত্র। তবে যে কারণে আজ দু'সপ্তাহ ধরে এত কথা বলা তা হলো, ১/১১-কে বিশ্লেষণ করা। আমি এই দুই কিস্তির আলোচনায় কোন সিদ্ধান্ত দিতে চাইনি। চাইনি কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ১/১১ নিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গেলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য। আজ যে কারণে জলিল সাহেব কিংবা অন্য যারাই শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর দিকে আঙুল তুলছেন, তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের অবস্থান থেকে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। ১/১১ বা তার কুশীলবরা ব্যক্তির সঙ্গে যা করেছেন তা হতে পারে নানা অসূয়া ও স্বার্থগত-শ্রেণীগত অবস্থান থেকে করেছেন, কিন্তু ১/১১ গোটা জাতিকে কী দিয়েছে তার সামগ্রিক বিশ্লেষণ এখন অতীব জরুরী। সরল কথায়, ১/১১-র নেট ফলাফল একটি নির্ভুল ভোটার তালিকার মাধ্যমে ২৯ ডিসেম্বরের অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। বাকি সব ভয়ঙ্কর সত্যকে ভুলে এই একটি মাত্র ন্যায়সঙ্গত সত্যকে দিয়ে ১/১১-কে বৈধতা দিতে আগ্রহী ব্যক্তিগতভাবে হলেও সামগ্রিক চিন্তায় ১/১১-কে বৈধতা দিতে আমার গণতান্ত্রিক বিবেকে বাধে। এ নিয়ে আবারও আমার কলামে আলোচনার ইচ্ছে রইল, তবে অন্য কোন সময়, তাই আপাতত ইতি টানছি ১/১১-র আলোচনায়।

লন্ডন, ২ জুলাই, বৃহস্পতিবার। ২০০৯।

masudabhatti@hotmail.com

বন্দী নির্যাতন ॥ রিগ্যান বুশ ওবামা সবাই এক

মূল : নোয়াম চমস্কি

অনুবাদ : এনামুল হক

(শেষাংশ)

সেদিনের উত্তেজক আপ্তবাক্যের নমুনা দিয়ে বলতে হয়, সন্ত্রাস হচ্ছে আধুনিক যুগের মহামারী ‘প্লেগ’, সন্ত্রাস হচ্ছে আমাদের কালে বর্বরযুগে ফিরে যাওয়া।’ সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ঐতিহাসিক চেতনা থেকে মুছে দেয়া হয়েছে। কারণ এর ফলাফলকে সরাসরি অনুশাসনের অন্তর্গত করা যায় না। মধ্য আমেরিকার বিধ্বস্ত দেশগুলোতে এবং আরও অনেক দেশে লাখ লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ মারা গিয়েছিল রিগ্যানের পছন্দের মিত্র বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক প্রতিবেশী দেশগুলোতে আয়োজিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে। এই দক্ষিণ আফ্রিকার নিজেকে রক্ষা করতে হয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের হাত থেকে। এই আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে ওয়াশিংটন ১৯৮৮ সালে বিশ্বের অন্যতম কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেছিল। সততার সঙ্গে বলতে গেলে এ কথাও যোগ করতে হবে যে, ২০ বছর পর কংগ্রেস ভোট দিয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল, যার জন্য ম্যান্ডেলা এখন মার্কিন সরকারের অব্যাহতি লাভ ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেন।

অসাধারণত্ববাদ ও বিস্মরণ

আজ যে মতবাদের রাজত্ব চলছে কখনও কখনও তাকে বলা হয় ‘আমেরিকার অসাধারণত্ববাদ।’ এ আসলে সে ধরনের কিছুই নয়। সম্ভবত : এটা সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলোর সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্স তার সভ্যতার আলো বিস্তারের অভিযানকে অভিনন্দিত করছিল এমন এক সময় যখন ফরাসী সমরমন্ত্রী আলজিরিয়ার দেশীয় জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। জনস্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, ব্রিটেনের আভিজাত্য বিশ্বের এক অভিনব জিনিস। ভারতকে মুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করতে এই দেবদূত সুলভ শক্তির যাতে কোন বিলম্ব না ঘটে তিনি সেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে ভারতীয়দের বিদ্রোহ দমনে ব্রিটেনের অনুসৃত ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কথা জনসাধারণ্যে প্রকাশ পাবার অল্পদিন পর তিনি মানবিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত তাঁর এই ক্লাসিক রচনাটি লিখেছেন। ভারতের বাকি অংশ দখলের কাজটা ছিল ব্রিটেনের বিশাল মাদক পাচার ব্যবসা। যা ততদিনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মাদক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল-- সেই ব্যবসার স্বার্থে আফিমের একচেটিয়া কারবার অর্জনেরই একটা প্রয়াস। এর উদ্দেশ্য মূলত ছিল ব্রিটেনের কারখানাজাত পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে চীনকে বাধ্য করা।

একইভাবে জাপানী সমরবাদীদের আন্তরিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশের কোন কারণ নেই, যারা নানকিংয়ের ধর্ষণ চালানোর সময় নির্দোষ জাপানী অভিভাবকত্বের অধীনে চীনে পার্থিব স্বর্গ নিয়ে আসছিল। ইতিহাস এ ধরনের ‘গৌরবোজ্জ্বল’ আখ্যানভাগে পরিপূর্ণ।

যতদিন এ ধরনের অসাধারণত্ববাদ মতাবাদগুলো দৃঢ়ভাবে রোপিত থাকবে, ততদিন ইতিহাস বিকৃতির ঘটনা মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেলেও তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধগুলো মুছে যাবে। ভিয়েতনামে টেস্ট অভিযান পরবর্তী শান্তি কর্মসূচীর ব্যাপক বৃহত্তর নৃশংসতার পাদটিকামাত্র ছিল মাই লাইয়ের হত্যাযজ্ঞ। সেই নৃশংসতাগুলো উপেক্ষিত হয়েছিল। অথচ মাই লাইয়ের মতো একটি অপরাধের ঘটনার উপর সকল ক্ষোভ ও ঘৃণা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ওয়াটার গেটের ঘটনাটি সন্দেহাতীতভাবে ছিল একটা অপরাধ। কিন্তু এই কেলেঙ্কারিকে নিয়ে যে প্রচণ্ড হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল তাতে দেশে-বিদেশে সংঘটিত সেই তুলনায় অনেক বড় বড় অপরাধ ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে দু’টি কুখ্যাত ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা হলো আততায়ীকে দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠক ফ্রেড হ্যাম্পাটনকে হত্যা। কুখ্যাত কয়েনটেলপ্রো দমন কিংবা কম্বোডিয়ায় বোমাবর্ষণের অংশ হিসাবে হ্যামটনকে হত্যা করা হয়েছিল। অত্যাচার-নির্যাতন যথেষ্ট ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ হলো ইরাক হামলা। মোটামুটিভাবে বলা যায়, বিশেষ বিশেষ নির্যাতন ভয়ঙ্কর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ইতিহাসের বিস্মরণ এক বিপজ্জনক ব্যাপার। এতে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ক্ষুণ্ন হয় সেই কারণেই যে এটা বিপজ্জনক তা নয়, আরও একটা কারণ হলো এর মধ্য দিয়ে আগামীদিনের অপরাধের ভিত্তি রচিত হয়।

(সমাপ্ত)

আইনমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি

তৈমূর আলম খন্দকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্ত আইনজীবী হিসাবে আদালতে (এই খোলা চিঠিতে পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী বলতে শ্রদ্ধেয় শেখ হাসিনাকে বুঝাবে) মামলা পরিচালনা না করার জন্য সংবিধান খেলাপী সেনা নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পেশীশক্তির বিশেষ বাহিনী কর্তৃক আপনাকে হুমকি প্রদানে আপনি জোরালো অভিযোগ করেন যা সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ২০০৮-এর প্রাক্কালে বিবিসিসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে আপনার ভয়েস-এ প্রচারিত হয়। ঐ ‘জংলী’ শাসনের সময়ে দুঃসাহসিক সত্য কথা বলায় আইনজীবী সমাজের সাথে আপনার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, ফলশ্রুতিতে আপনি দ্বিতীয়বার বারের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ায় নির্যাতিত ও গণতন্ত্র প্রত্যাশী জনগণ খুশি হয়েছিল। উল্লেখ্য, আপনার মতো আইনজীবীকে যেখানে হুমকি দেয়া হয়েছে সেখানে কাঙ্ক্ষিত আইনজীবী নিয়োগের জন্য আমাদের অবস্থা কি ছিল তা অবশ্যই আপনার সহজেই অনুমান করার কথা।

ঐ দুঃসময়ের আপনিসহ ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, সাংবাদিক নুরুল কবীর, সাবেক সচিব আসফদ্দৌলা, সাংবাদিক আতাউস সামাদ, ফরহাদ মাজহার, মাহফুজ উল্লাহ, সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান, অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল্লাহ সমেত গুটিকয়েক আইনজীবী ও সাংবাদিক দুঃসাহসিক ভূমিকা রাখায় জাতি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের সালাম ও শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু যে-সকল চাটুকার বুদ্ধিজীবী, যারা বন্দুকধারী অনির্বাচিত সরকারের দীর্ঘায়ু কামনা করেছে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। স্বনামধন্য আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক বলেছেন, দুদকের নাম শুনলে দুই বছরের শিশু আঁতকে ওঠে। কিন্তু আমি বলতে চাই স্বাধীনতার নামে দুদক কতটুকু স্বেচ্ছাচারিতা ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছে তার প্রধান সাক্ষী আজকের প্রধানমন্ত্রী এবং আপনি স্বয়ং। দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনের নিয়োগের স্বচ্ছতা এবং বৈধতা নিয়ে ইতোমধ্যে জোরালো প্রশ্ন উঠেছে। সাবেক চাকরিরত উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বেআইনীভাবে গঠিত এনসিসি’র চেয়ারম্যান (তৎকালীন উপদেষ্টা) মেজর জেনারেল (অব) আব্দুল মতিনের স্বেচ্ছাচারিতা ও আইন বহির্ভূত কথাবার্তা যথা চুনোপুঁটি, রুই-কাতলা ধরব, কয়টায় ছাড়া পাবে? একটায় ছাড়া পেলে আরেকটায় ধরব ইত্যাদি। এসব কথা কি নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারের অন্তরায় নয়? উপদেষ্টার এ কথাই রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে একের পর এক সিরিজ মিথ্যা মামলা সৃজনের ইঙ্গিত ও নির্দেশ বহন করে। একজন উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নিয়ে এ ধরনের কথাবার্তা কি সংবিধানের নিরাপত্তা হেফাজত করে? উক্ত কথা যদি আইনবিরোধী হয়ে থাকে তবে অর্বাচীন বাকপটু উপদেষ্টাদের কি গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক বিচার হবে না?

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক প্রকাশ্যে বলেছেন, একজন মেজর সুপ্রীমকোর্টের কার্যতালিকা (Cause list) প্রণয়ন করে। হাসান মশহুদ (দুদক চেয়ারম্যান) ফাইল হাতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করেন। সে ফাইলে কি ছিল– তা নিয়েও সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গণে মুখরোচক কথাবার্তা আছে। একজন বাদী বা রেস্রণডর্লধমভ বা যিনি বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে

Interested party তিনি দেশের প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করার রেওয়াজ ইতোপূর্বে ছিল কি? এটা কি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে না? সর্বোচ্চ আদালতকে প্রভাবিত করার বিষয়টি এতটুকু পর্যন্ত গড়ায় যার জন্য আপনার সভাপতিত্বে সভার সিদ্ধান্ত বলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতিকে সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি সংবর্ধনা দেয়নি, যা নজিরবিহীন এবং এ জন্য আপনি প্রশংসিত হয়েছেন। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত আইনজীবীদের এ ভূমিকা গণতন্ত্র রক্ষার যাত্রাপথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক বলেছেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে সংসদ ভবনে স্থাপিত বিচারিক আদালতের বিচারকগণ সাজা দেয়ার স্কোর করার জন্য শচীন টেন্ডুলকরের মতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সংসদ ভবনের আদালতের বিচারকের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "রায় অন্য জায়গা থেকে লেখা হয় আপনার দায়িত্ব শুধু পড়ে শোনানো"। তিনি মুক্ত হওয়ার পর বলেছেন দুর্নীতি দমনের জন্য নয় বরং বিরাজনীতিকরণের জন্য দুদক রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে মামলা করছে। এজন্য সংসদ ভবনে স্থাপিত আদালত দুদক কোর্ট বা পত্রিকার ভাষায় ক্যাঙ্গারু কোর্ট নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও তদন্তের বালাই ছিল না। বিচারকার্য কতটুকু নিরপেক্ষ হয়েছে তা তো আপনি নিজেই দেখেছেন। আইনের ৩(২) ধারা মোতাবেক দুদক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এনসিসি (জাতীয় সমন্বয় কমিটি) রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় যার নাম প্রকাশ করেছে, কোনরূপ নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বা তদন্ত বা অভিযুক্তকে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই চার্জশীট দিয়েছে এবং যার বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়েছে ক্যাঙ্গারু কোর্ট তাকেই সাজা দিয়েছে পুরোমাত্রায়। যার ফলশ্রুতিতে কোর্টগুলো বিতর্কিত নামে আখ্যায়িত হয়েছে যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এ কোর্টগুলো টাস্কফোর্স এর দোসর হিসাবে কাজ করেছে বিধায় জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা হারিয়েছে। সংসদ ভবনের কোর্টগুলো ছিল টাস্কফোর্স এবং পিপিদের খবরদারিতে; মামলা চলাকালীন সময়ে সাদা পোশাকধারীরা কোর্টে বসে সাক্ষীদের রক্তচক্ষু দেখাত এবং তাদের শিখানো মতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করত। অস্ত্রের মুখে টাস্কফোর্স-এর গাড়িতে সাক্ষীদের কোর্টে হাজির করত। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়ায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিনের মামলার সাক্ষীদের পিটিয়ে হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। অনেক সাফাই সাক্ষীকে পিটিয়ে আহত করার নজিরও ঐ কোর্টগুলোতে রয়েছে যা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আমার সাফাই সাক্ষী মহিউদ্দিনকে দুদক কর্মচারী ও টাস্কফোর্স ধরে নিয়ে যায়। সংসদ ভবনে কোর্টের পাশেই ছিল টাস্কফোর্স ও দুদকের অফিস। বিশেষ বাহিনীর দাপটে কোর্টের সবাই থাকত তটস্থ। জজ ও আইনজীবী আসলেও বিশেষ বাহিনীর লোকের না আসা পর্যন্ত কোর্টের তালা খুলত না। এ বিশেষ বাহিনী মাঝেমধ্যে আসামীদের খাবার দেয়া বন্ধ করে দিত। কোর্টের অনুমতি নিয়ে মাত্র ২০/৩০ মিনিট আত্মীয়স্বজনদের সাথে কথা বলতে পারতাম। কথা বলার সময়ও বিশেষ বাহিনী সাদা পোশাকে ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকত। সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন মাত্র ৩০ মিনিটের জন্য আত্মীয়স্বজনের সাথে জেল গেটে গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে কথা বলতে পারতাম। নাম দেয়া হয়েছিল– "ভিআইপি, বন্দী" কিন্তু ব্যবহার ছিল নির্মম। কোর্টে আনা-নেয়ার সময় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্বর হানাদার পাক সেনারা গাড়ি থামিয়ে বাংলাদেশীদের হিন্দু না মুসলিম পরীক্ষা করত ঠিক অনুরূপভাবেই জেল গেটে গোয়েন্দাদের সামনে সিনিয়র রাজনীতিবিদদের দেহ তল্লাশি করত। এতে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী-ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সিনিয়র মন্ত্রী শেখ সেলিম, মোঃ নাসিম, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, ইঞ্জিঃ মোশারফ হোসেন, মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী, মেয়র কামরান ও সাকা চৌধুরীসহ মন্ত্রীদের স্ত্রী-সন্তান কেউই বাদ যান নাই। শুধুমাত্র অপমান করার জন্য ডিভিশনপ্রাপ্ত আসামী হওয়া সত্ত্বেও তারেক জিয়াকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে কোর্টে হাজিরা করা হয়। ক্যাঙ্গারু কোর্টে দুদক কর্মচারী, গোয়েন্দা ও পুলিশের ব্যবহার ছিল নির্মম। একটি এয়ার টাইট রুমে দমবন্ধ পরিবেশে সংসদ ভবনের কোর্ট হাজতখানা করা হয়েছিল। নিশ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়ায় ভিআইপি বন্দী অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এভাবে দুদক কোর্টে আমাদের মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। বিচার চলাকালে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না পেয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্থ হয়েছি। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত প্রতিটি সম্পদের মামলায় মনগড়াভাবে দুদক সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করে মিথ্যা মোকদ্দমা দিয়েছে। দুদক আইন/০৪ এবং দুদক বিধি/০৭-এর বিধান প্রতিপালন না করে অভিযুক্তকে বক্তব্য রাখার সুযোগ প্রদান করা ছাড়াই প্রত্যেকটি মামলায় মনগড়া অনুসন্ধান ও তদন্ত করে ভুয়া চার্জশীট দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কোর্টগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। যার বহু অভিযোগ মিডিয়াতে আপনি স্বয়ং করেছেন, এ অভিযোগগুলো আপনার সহকর্মী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, আইন প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামেরও ছিল। সবচেয়ে বড় কথা রায় অন্য জায়গা থেকে লিখে দেয়া হয় এবং আদালতে শুধু পড়ে শোনানোর যিনি প্রকাশ্যে এ অভিযোগ করেছিলেন তিনি আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। এরপরও কি ক্যাঙ্গারু কোর্টের রায় কার্যকর থাকবে?

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক টক শোতে বলেছেন দুর্নীতি দমনের নামে দুদক বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ওপর কালিমা লেপন করেছে। তিনি আরও বলেছেন, দুদকের লোকেরা Hot Headed (গরম মাথা)। নির্বাচন ছাড়া রাষ্ট্রপতি হওয়ার উচ্চাভিলাষীরা মাইনাস-২ ফর্মুলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবেদিত রাজনীতিবিদদের জাতীয় নির্বাচনে অযোগ্য করার জন্য দুদককে 'মিথ্যা মামলা তৈরির একটি ফ্যাক্টরিতে' পরিণত করে। যার তথ্য-উপাত্ত আপনি নিজে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে উপস্থাপন করেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা কাঙ্ক্ষিত আইনজীবী নিয়োগ করতে পারি নাই। ফৌজদারি বিষয়ে পারদর্শী কোন আইনজীবী আমাদের নিয়োগ করতে দেয়া হয় নাই। আইনজীবীদের Income Tax File-এর ভয় দেখানো হয়। আমাদের মামলা না করার জন্য অনেক স্বনামধন্য, আইনজীবীকে দুদক টাকা দিয়েছে। অনেক আইনজীবীকে ধমক দিয়েছে। দুদক ফির নামে অগ্রিম টাকা দিয়ে বা Income Tax file-এর ভয় দেখিয়ে অনেক আইনজীবীকে আমাদের মামলা করা থেকে বিরত রেখেছে।

রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার জন্য দুদকের টাস্কফোর্স কত প্রকার ও কি কি নির্যাতন করেছে তার সাক্ষী আপনার হাতের নাগালেই। সংসদে আপনার পাশেই বসা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আবদুল জলিল, শেখ সেলিম, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ওবায়দুল কাদের, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ইঞ্জিঃ মোশাররফ হোসেন, মির্জা, আযম, কামাল মজুমদার, লোটাস কামাল, সাকা চৌধুরী, মজিবুর রহমান সারোয়ার,এমকে আনোয়ার, জয়নাল আবেদীন ফারুক, কাজী জাফরউল্ল্যাহ, হাবিবুর রহমান মোল্লা ও ড. তৌফিক-ই-এলাহী (বীর প্রতীক) এবং দুদকের মামলা খাওয়া আপনার সহকর্মী মন্ত্রী ও এমপি মহোদয়দের জিজ্ঞাসা করলেই পাবেন। রিমান্ডের নামে থানায় না রেখে অন্ধকূপে (ঢা. বি. অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের ভাষায় যা ব্লাকহোল) নির্যাতনের কাহিনীও শুনতে পাবেন। জামা খুললে অনেক নেতা, এমপি ও মন্ত্রীর গায়ে নির্যাতনের ক্ষতবিক্ষত স্থানও দেখতে পাবেন। এসব জেনেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শারীরিক নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তাঁর নেতা-কর্মীদের বলেছিলেন, "তোমরা আমার নামও বলে দিও"।

সাধারণ মানুষ যাদের পিটিয়ে মিথ্যা সাক্ষী সাজিয়ে রাজনীতিবিদদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে তাদের কথা শোনার জন্য একটি কমিশন গঠন করুন। (চলবে)

লেখক : রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী।